# শিল্পের জন্য জমি: উপায় আছে, বিলক্ষণ

জমি অধিগ্রহণ আইন বদলানো নিশ্চয়ই জরুরি। কিন্তু সে জন্য আরও অনেক ভাবনাচিন্তা করা দরকার। তার উপায়ও আছে।

**মৈত্রীশ ঘটক ও পরীক্ষিৎ ঘোষ**

**সেই ট্র্যাডিশন।** সমস্যার নাম জমি অধিগ্রহণ। চিকমাগালুর, কর্নাটক। সেপ্টেম্বর ২০১১। *পি টি আই*

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর জমি অধিগ্রহণ নিয়ে নতুন বিল সংসদে পেশ হল। শীতকালীন অধিবেশনে এর ওপর ভোটাভুটি হওয়ার সম্ভাবনা। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম কাণ্ডের জেরে বামফ্রন্টের গদি টলেছে বটে, কিন্তু এ ব্যাপারে গোলমাল বাধানোটা তাদের একচেটিয়া কারবার নয়। সারা দেশেই শিল্প বা পরিকাঠামোর জন্য জন্য চাষের জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে মুশকিল দেখা দিচ্ছে। ওড়িশার কলিঙ্গনগরে, উত্তরপ্রদেশের ভট্টা পরসৌলে, মহারাষ্ট্রের জয়তাপুরে চাষিদের প্রতিবাদ খবরের কাগজে শিরোনাম হয়েছে। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, বি জে পি, বি এস পি— সব দলের সরকারই বিক্ষোভের মুখে পড়েছে। ১৮৯৪ সালের যে জমি অধিগ্রহণ আইন আজও বহাল, তার মধ্যে যে বিরাট একটা গলদ রয়েছে, এ থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। ও দিকে শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়নের যা হার, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজের যে দ্রুত প্রসার, তা থেকে অনুমান হয়, এই ধরনের সংঘাত বাড়বে বই কমবে না। জমি অধিগ্রহণ আইনের আমূল পরিবর্তন তাই অত্যন্ত জরুরি।

সংসদে আনা নতুন বিল কিন্তু সমাধানের সূত্র জোগাতে পারল না। চলতি আইন অনুযায়ী সরকার জমি অধিগ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে জমির যে বাজার দর সম্প্রতি নথিভুক্ত হয়েছে, সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। নতুন আইন বলছে, গ্রামাঞ্চলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বাজার দরের অন্তত চার গুণ, আর শহরাঞ্চলে নিদেনপক্ষে দ্বিগুণ। এ ছাড়া কিছু বাধ্যতামূলক সুযোগসুবিধাও রাখা হয়েছে। যেমন, পরিবারের কাউকে চাকরি অথবা ২০ বছর ধরে ২০০০ টাকা মাসিক ভাতা কিংবা এককালীন ৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু বাজার দরকে কেন ২ বা ৪ দিয়ে গুণ করতে হবে, কেন ৩ বা ৫ দিয়ে নয়, তার ব্যাখ্যাটা অজানা থেকে যাচ্ছে।

বাজার দরের সমান ক্ষতিপূরণ একেবারেই অযৌক্তিক এবং অন্যায্য। গ্রামাঞ্চলে জমির কেনাবেচা খুবই কম, হিসেবনিকেশ বড় একটা নেই। আসল দামের একটা বড় অংশ গোপন রাখা হয় স্ট্যাম্প ডিউটি এড়াতে। অনেকেই বিপদে পড়ে জলের দরে জমি বেচেন। তবে এ সব বাদ দিলেও বাজার দরকে মাপকাঠি করার পিছনে যুক্তির একটা বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে। জমির যাঁরা মালিক, তাঁরা যদি বাজার দরকে যথেষ্ট গণ্য করতেন, তা হলে তো সরকারি অধিগ্রহণের জন্য অপেক্ষা না করে জমি বাজারেই বেচে দিতেন। তা যখন করেননি, তখন ধরতে হবে এঁদের কাছে জমির মূল্য বাজার দরের চেয়ে বেশি, হয়তো বা ঢের বেশি। তা হলে বাজার দরটুকু দিলে তাঁরা রাগ করবেন না কেন?

সিনিক কে, এই প্রশ্নের উত্তরে অস্কার ওয়াইল্ড বলেছিলেন, যিনি জিনিসের দর জানেন, কিন্তু কদর বোঝেন না। আইনপ্রণেতাদের চিন্তাভাবনা দেখলে সেই কথাই মনে হয়। জমির সব মালিকের কাছে জমির কদর বা মূল্য এক নয়। ছোট চাষি জমি বন্ধক রেখে ধার নিতে পারেন, সম্পন্ন চাষির ঋণের তেমন প্রয়োজন নেই। যিনি নিজেই চাষবাস করেন, তাঁর কাছে জমি মানে বারো মাস কাজের জোগান, আর খাদ্য দুর্মূল্য হলে নিজের খেতের ফসল খেয়ে জীবনধারণ করার সুযোগ। যিনি অনাবাসী মালিক, হয়তো শহরে থাকেন, তাঁর কাছে এই সুযোগসুবিধার দাম নেই, খাজনাটুকুই সম্বল। এ সব কারণে মালিকরা কে কত ন্যূনতম দামে জমি ছাড়তে রাজি আছেন, তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। আর এই তথ্য একমাত্র তাঁরা নিজেরাই জানেন, কোনও পণ্ডিত আঁক কষে তা বের করতে পারবেন না। জমি অধিগ্রহণের নিয়মকানুন এমন ভাবে বানানো উচিত, যাতে মালিকরা অন্তত তাঁদের নিজস্ব মূল্য বা কদর অনুযায়ী দাম পান। আর অধিগ্রহণের পর চাষের জমি যেটুকু পড়ে রইল, সেটা তাঁদের হাতে যাওয়া উচিত, যাঁদের কাছে জমির কদর সবচাইতে বেশি।

তবে জমির বাজার যদি ঠিকঠাক কাজ করত, তা হলে কিন্তু বাজার দর অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিলে তেমন সমস্যা হত না। কারণ, যাঁদের কাছে জমির প্রয়োজন খুব বেশি, তাঁরা ক্ষতিপূরণের টাকায় কাছেপিঠে অন্য জমি কিনে নিতে পারতেন। দু'টি কারণে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। প্রথমত, গ্রামাঞ্চলে জমির বাজার খুবই অনুন্নত, শহরের মতো নয়। ঠিকঠাক সুলুকসন্ধান পাওয়া মুশকিল, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ ঘটানোর মতো দালাল খুঁজে পাওয়া ভার। দ্বিতীয়ত, একটা কারখানা বা টাউনশিপ হলে এলাকায় জমির দর হু-হু করে বেড়ে যায়, তাই ক্ষতিপূরণের টাকায় সমপরিমাণ জমি কেনা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

অতএব, বাজার দরের থেকে ক্ষতিপূরণ যে বেশি হতে হবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কতটা বেশি দিলে চাষিরা খুশি মনে মেনে নেবেন, বিক্ষোভ বন্ধ হবে, সেটা কষে ওঠাই শক্ত কাজ। নতুন আইন ঠিক দিকেই এগিয়েছে, তবে আন্দাজে ঢিল ছুড়ে। চতুর্গুণ দাম কোনও ক্ষেত্রে অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে, আবার কোনও ক্ষেত্রে হয়তো যথেষ্ট হবে না। যেমন ধরুন উত্তরপ্রদেশে যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে বানাতে সরকার যে দামে জমি নিয়েছিলেন, দশ বছরের মধ্যে সেখানে জমির দর অন্তত ৫০ গুণ বেড়ে গিয়েছে। এ অবস্থায় ৪ গুণ দাম দেওয়া হলেও কি অসন্তোষ মিটত? আবার খরচ বেড়ে যাওয়ার ফলে কোথাও হয়তো শিল্পস্থাপন হলই না। সেখানে হয়তো ৩ গুণ দাম দিলে শিল্পও আসত, চাষিদেরও উপকার হত।

**প্রথমত, গ্রামাঞ্চলে জমির বাজার খুবই অনুন্নত। দ্বিতীয়ত, একটা কারখানা বা টাউনশিপ হলে জমির দর হু-হু করে বেড়ে যায়, তাই ক্ষতিপূরণের টাকায় সমপরিমাণ জমি কেনা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।**

একটা বাঁধাধরা ফর্মুলায় না-ফেলে নিলামের মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণ হলে সবচেয়ে ভাল হয়, এটাই আমরা মনে করি। কারখানা বা পরিকাঠামো বানাতে যে জায়গাটুকু লাগবে, তার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জুড়ে সরকার নিলামে খানিক জমি কিনুক। কারখানার এলাকায় যাঁরা নিলামে জমি বেচলেন না, তাঁদের টাকা দেওয়ার বদলে পাশাপাশি এলাকায় কেনা জমি হস্তান্তর করা হল। এ ভাবে এগোলে অনেক শান্তিপূর্ণ মীমাংসা সম্ভব।

## নিলামের নিয়মকানুন

উদাহরণ হিসেবে সিঙ্গুরের সমস্যাটাই নেওয়া যাক। ন্যানো-র কারখানার জন্য জমি প্রয়োজন ১০০০ একর। তার চার পাশে আরও ১০০০ একর নিয়ে সাকুল্যে ২০০০ একর জমির ওপর নিলাম ডাকা হোক। এই এলাকায় যাঁদের জমি আছে, একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তাঁদের নিজস্ব জমির জন্য সরকারের কাছে একটা দাম চেয়ে টেন্ডার দিতে হবে। কত দাম চাইবেন, সেটা সম্পূর্ণ তাঁদের ইচ্ছে। নিলামের নিয়ম হল, যে ১০০০ একর জমির ওপর একর পিছু সবচেয়ে কম দাম চাওয়া হয়েছে, সরকার সেই সমস্ত জমি কিনে নেবে। কী দামে কিনবে? প্রথমেই বলে নিই, যিনি যা দামই হেঁকে থাকুন না কেন, সকলকে একর পিছু একই দাম দেওয়া হবে। যে সমস্ত জমি নিলামে কেনা হল না, তার মধ্যে যে জমিতে সবচেয়ে কম দর চাওয়া হয়েছিল, সেটাই সমস্ত জমির দাম হিসেবে ধার্য হবে। এই দামেই বিক্রেতাদের থেকে জমি নেবেন সরকার। এবং, জমির মালিকরা টেন্ডার জমা দেওয়ার আগেই তাঁদের নিলামের এই নিয়ম বিশদে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

যাঁদের জমি এ ভাবে নিলামে বিক্রি হল, তাঁদের অভিযোগের কোনও কারণ নেই। কেননা, তাঁরা স্বেচ্ছায় যে-দাম চেয়েছিলেন, তার থেকে বেশি বই কম পেলেন না। এই সমস্ত চাষির দাবিদাওয়া তো মিটল, কিন্তু সমস্যার এখনও পুরোপুরি সমাধান হয়নি। কারখানার জন্য যে ১০০০ একর চিহ্নিত করা হয়েছে, তার পুরোটাই যে নিলামে উঠে আসবে এমন কোনও কারণ নেই, কারণ নিলাম হচ্ছে আরও বিস্তৃত ২০০০ একর জমির ওপর। ধরা যাক কারখানার চিহ্নিত এলাকার মধ্যে ৬০০ একর নিলামে বিক্রি হয়েছে, ৪০০ একর এখনও বাকি। এই জমিটুকুর দখল সরকার নেবেন কী করে? এই জমির মালিকদের জমি ছাড়তে হবে, কিন্তু তাঁরা সমপরিমাণ জমি পাবেন কারখানার গণ্ডির বাইরে। কারখানার চিহ্নিত এলাকার মধ্যে যতটুকু নিলামে কেনা হয়নি, ঠিক সেই পরিমাণ জমি কেনা হয়েছে বাইরের অংশটাতে, সুতরাং অঙ্কটা মিলতেই হবে।

জমি অধিগ্রহণ আইনের গোড়ায় গলদটা ভেবে দেখুন। সরকার মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের জমির দখল নিতে পারেন। শুধু তা-ই নয়, দামটাও নিজের খেয়ালখুশি মতো ধার্য করে দেন। জমির মালিকের মতামতের সেখানে কোনও স্থানই নেই। ক্ষতিপূরণের পরিমাণটুকু যদি সরকারি মর্জির বদলে মালিকদের দাবি অনুযায়ী ঠিক হয়, তবে তো জবরদস্তির মাত্রাটা অনেকটাই কমে, অভিযোগের কারণ বিশেষ থাকে না। চাষিদের দু'টি অভিযোগ প্রধানত শোনা যায়— ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট পাইনি, আর জমি গেলে খাব কী? আমরা যে প্রক্রিয়ার কথা বললাম, সেখানে তাঁরা জমির বদলে জমি পেতে পারেন, আর টাকায় ক্ষতিপূরণ নিলে নিজের দাবির থেকে এক পয়সাও কম পাবেন না।

অবশ্য অধিগ্রহণের খরচ যাতে সাধ্যের বাইরে না চলে যায়, সে জন্য নিলামের আগেই সরকারকে দামের একটা ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দিতে হবে। নিলামের দর সেটা ছাড়িয়ে গেলে অধিগ্রহণ বাতিল করে অন্য কোথাও জমির সন্ধান করা চাই। এ ছাড়াও অন্যান্য সমস্যা আছে। যেমন, সব জমি সমান উর্বর নয়, ঘর থেকে জমির দূরত্ব বেড়ে যেতে পারে, জমি হস্তান্তরের একটা ঝকমারি আছে। এ কারণে নিলামের দামটুকু ছাড়াও কৃষকদের একটা এককালীন সাহায্য দেওয়া উচিত। ক্ষতিপূরণের সিংহ ভাগটাই নিলাম মারফত ঠিক হলে সমস্যা অনেক কমবে। জমির মালিক ছাড়াও নতুন আইনে ভাগচাষি বা শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বরাদ্দ হয়েছে। এটা মোটের ওপর ভাল, তবে বিশদ আলোচনায় যাব না।

## কৃষি, শিল্প ও উন্নয়ন

নতুন বিলে নানা রকম বিধিনিষেধ ঢোকানো হয়েছে। যেমন, বহু-ফসলের জমি চট করে নেওয়া যাবে না, জনস্বার্থ জড়িত না থাকলে সরকার টাটা-র মতো কোম্পানির হয়ে জমি কিনতে পারবেন না। এ ব্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামত যে গুরুত্ব পেয়েছে, সন্দেহ নেই। এই সব বিধিনিষেধ কিন্তু মনে খটকা জাগায়। নতুন আইনের ভূমিকায় লেখা হয়েছে: 'যাঁদের জমি নেওয়া হল, তাঁদের উন্নয়নের ভাগীদার বানাতে হবে। অধিগ্রহণের পরে এঁদের জীবনযাত্রার মান যেন বেড়ে যায়।' এ অতি উত্তম কথা, উন্নয়নের মূলমন্ত্র তো এ রকমই হওয়া উচিত। নতুন আইন যদি এ ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে পারে, তবে কোম্পানিদের হয়ে জমি অধিগ্রহণে বাধাটা কোথায়? শিল্পস্থাপন হল, কৃষকদেরও জীবনযাত্রার মান বাড়ল, এ কি কাম্য নয়? বহু-ফসলের জমিতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বেশি, তা সত্ত্বেও শিল্পপতিরা কেন সেখানে যেতে চান? কারণ, যেখানে-সেখানে কারখানা বানানো চলে না— রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, জল, পরিবহণ, লোকলস্কর, এই সমস্ত জিনিসের জোগান চাই। মালিকরা যথাযথ ক্ষতিপূরণ পেলে আপত্তির কী কারণ বাকি থাকে?

আমাদের দেশে এখনও দারিদ্র অনেক, আর্থিক বৈষম্য প্রচুর। কেউ সাতাশ-মহলা প্রাসাদে থাকেন, কেউ ফুটপাথে। অবাধ পুনর্বণ্টন যদি সম্ভবও হয় এবং উৎপাদনের ওপর তার কোনও প্রভাব না-ও পড়ে, সমস্যা মিটবে না, কারণ আমাদের দরিদ্রশ্রেণির মানুষের সংখ্যা প্রচুর এবং গড় জাতীয় আয় উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। সামগ্রিক ভাবে একটা দেশের কথা যদি ধরি, তা হলে আয়ের অপর পিঠ উৎপাদন। উৎপাদন বাড়াতে না পারলে আমাদের দারিদ্র ঘোচার আশা নেই। আপামর জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে গেলে গ্রামে গ্রামে ইস্কুল, হাসপাতাল, পাকা বাড়ি, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, চওড়া রাস্তা, এই সবের প্রয়োজন। এ জিনিস গাছে ফলে না, খেতের ফসল থেকে তৈরি হয় না। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য তাই শিল্পের প্রসার ঘটানোর কোনও বিকল্প নেই।

*মৈত্রীশ ঘটক লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এ অর্থনীতির শিক্ষক। পরীক্ষিৎ ঘোষ দিল্লি স্কুল অব ইকনমিকস-এ অর্থনীতির শিক্ষক।*